প্র স্তা ব না

সময়ের প্রসবযন্ত্রণা ভিন্ন সাহিত্যে সৃজন অসম্ভব। সময়ই গড়ে নেয় সমসাময়িক সাহিত্যের আদল, অস্থি, অস্তিত্ব। প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে অধুনান্ত সাহিত্যের আঁতের কথা সেটাই। কালচক্রে বিলীন হয় অতীত সৃজনের রাজপাঠ। আবার সময়ের সন্ধানী চোখ খুঁজে নেয় আপাত অচল পূর্বসৃজনের মধ্যে সুপ্ত সমকালোচিত প্রাসঙ্গিক সৃজন ও অর্থের সম্ভাবনা। চলতে থাকে কালক্রমিক সাহিত্যের পরম্পরা। তৈরি হয় নব নব বয়ানের ইমারৎ। কালে কালে তার দিকেও ধেয়ে আসতে থাকে সংশয় আর পরিপ্রশ্নের মৎকুণ। বিনষ্ট হয় প্রতিষ্ঠিত অর্থের পিকতান। তাই নতুন শব্দের ব্যবহারের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে শব্দের নতুন ব্যবহার। সাহিত্যবস্তুর মৌলিক কাঠামোর মধ্যে শব্দলগ্ন অর্থের আত্মঘাতী সম্ভাবনাকে স্বীকার না করলে সাহিত্যের কালজয়ী হয়ে ওঠার আর কোনো পথ নেই উত্তরাধুনিকতার এই সমকালে। বিনির্মাণবাদ সাহিত্যের শব্দনির্মিত কাঠামোর মধ্যে অর্থের সেই আত্মঘাতী সম্ভাবনাকে বহুমাত্রিক করে তোলে। বহুরৈখিক করে তোলে সাহিত্যের অর্থগত বয়ানের নানা স্তরকে। মনসামঙ্গল কাব্যকে বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করার দরকার তার মধ্যে সুপ্ত ওই অর্থগত বহুরৈখিকতাকেই উন্মুক্ত করার জন্য। তদ্‌ভিন্ন কালান্তরের সাহিত্যপাঠের মধ্যে এই কাব্যের মহাকালের আশীর্বাদ প্রাপ্তির অন্য উপযুক্ত পন্থা নেই বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলা মধ্যযুগের কাব্য বলতে মঙ্গলকাব্যের কথাই প্রথমে মনে আসে আমাদের। কারণটা অবশ্যই এই কাব্যধারার বিস্তার। শ্রেণিগত এবং ভৌগোলিক। আর এই কাব্যধারার জনপ্রিয়তম শ্রেণি হল মনসামঙ্গল। অবিভাজ্য বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে লেখা হয়েছে মনসামঙ্গল বা মনসাকেন্দ্রিক পালা। কোথাও তার নাম মনসামঙ্গল, কোথাও মনসাবিজয় বা কেতকাপুরাণ বা পদ্মাপুরাণ। মনসালগ্ন নানারকম কাহিনি সে সব কাব্যের বিষয়বস্তু। তবে মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনিই সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত। নিষ্ঠ পাঠক, গবেষক ও সাহিত্যের নিবিড় ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া আজও হয়ত অনেকে জানেনই না যে, মনসা-চাঁদ সদাগর কেন্দ্রিক জাগর পালার কাহিনি ছাড়াও

জালু-মালুর কাহিনি সহ আরও কয়েকটি মনসা কেন্দ্রিক কাহিনির অস্তিত্ব আছে। যাই হোক, একটা তথ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার, মনসামঙ্গলের কাহিনি এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। গ্রামীন বঙ্গভূমে চাষা-ভুষো বাঙালির সঙ্গে সাপ-খোপের নিত্য ওঠা বসা। ফি-বছর সর্পদষ্ট হয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বাঙালির কাছে জল-ভাত। এহেন সাপের সাথে লড়াই করা একটা মানুষ, সাপের দেবীর নাছোড় পূজা-প্রত্যাশা, দড় কষাকষি, এসব মিলে কাহিনিতে মুখরুচির উপাদানগত অভাব নেই। কাহিনির জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে আরও একটা দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতেই হচ্ছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' (১৯৩৯) গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশ্বাস 'চাঁদবেনের গল্পটি আগা-গোড়া কল্পনা-মূলক'। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ইহার মূলে নগন্য হইলেও যে কোনো না কোনো সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই কাহিনীটি উদ্ভুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা অত্যন্ত ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইহা বাংলাদেশের রামায়ন। সর্পপূজার জনপ্রিয়তা ইহার ব্যাপক প্রচারের অন্যতম কারণ হইলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনী সেই যুগে বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র কাহিনীগত ঐক্য রক্ষা করিয়া এমন প্রচার লাভ করিতে পারিত না। বিশেষত সেই যুগে কোনও কবিবিশেষের স্বকপোলোদ্ভাবিত কোনও সম্পূর্ণ অলীক কাহিনীর সমাজে এমন সমাদর লাভ করা সম্ভব ছিল না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টির সাহায্যে যে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ এ কথা সত্য যে, 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কবি মুকুন্দরাম ও 'অন্নদা-মঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবিশক্তি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনায় কদাচ নিয়োজিত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও কোনও মঙ্গলকাব্যই মনসা-মঙ্গলের মত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাতে উচ্চাঙ্গের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কোন বাস্তব আদর্শ চোখের সম্মুখে না থাকিলে

> দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি দ্বারা এমন চরিত্র পরিকল্পনা সম্ভব হইত বলিয়াও মনে হয় না। বিশেষত ইহার চরিত্রগত আদর্শসৃষ্টি যতই উচ্চ হউক, ইহার মূলে অন্তত কিছু সত্য না থাকিলে ইহা জাতির মানসক্ষেত্রে এমন সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়াও তুলিতে পারিত না।
>
> তাহা হইলে এই কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য থাকিতে পারে? স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, 'চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদ সদাগর তাঁহাদের দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন'। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও একটু কাহিনী স্বচ্ছন্দে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিষেকোৎসুক রাজপুত্রের উপর দীর্ঘ বনবাসের নিদারুণ আদেশ যেমন এক করুণ মহাকাব্যের মূল সত্য, তেমনই বিবাহিত জীবনের আনন্দোৎসুক কোন অতুল ঐশ্বর্যবান যুবক শ্রেষ্ঠিপুত্রের বাসরগৃহেই দৈবাৎ সর্পদংশনে মৃত্যুর মত কোন মর্মান্তিক ঘটনাও হয়ত এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মূল সত্য। সেদিন অপরিস্ফুট-যৌবনা বেহুলার বাসর-রাত্রেরই বৈধব্যের কথা শুনিয়া বাল-বৈধব্য-পীড়িত এই হিন্দুর সমাজও হয়ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ-তরুণীর প্রস্ফুটোন্মুখ জীবনের মূলে ক্রূর নিয়তির নিদারুণ এই পরিহাস যে কোন কাব্যের রস-প্রেরণা দান করিতে সক্ষম। তারপর এতদ্দেশীয় সাহিত্যিক প্রথা অনুযায়ী কাহিনীটিকে একটি মিলনান্তক রূপ দিবার জন্য ইহার অবশিষ্টাংশ কবি কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে।[১]

অর্থাৎ কাহিনিটির জনপ্রিয়তার মধ্যে একটা বাস্তব ঘটনার আনুকূল্য থাকতে পারে। আলোচনাতে পরিষ্কার যে, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রথমেই রামায়ণের কাহিনিকে সত্যমূলক ধরে নিচ্ছেন। তারই প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গলের কাহিনিকে সত্যসিদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছেন। বিষয়টা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে তখনই, যখন

আমরা তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত অর্থাৎ রামায়ণের কাহিনিকে সত্যমূলক ধরে নেব। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আশুতোষবাবুর অভিমতের চুলচেরা বিশ্লেষণও বর্তমান গবেষণার অভিমুখ নয়। মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে একটি উল্লেখ্য তথ্য মাত্র। আমাদের মনে হয় কাহিনির মধ্যে যে রোমহর্ষক টান টান ব্যাপার আছে, আর আছে কাহিনি বলার ঢং-এর মধ্যে যে সহজপাচ্যতা, তাইই কাহিনিটিকে বিস্তার দিয়েছে। জনপ্রিয়তা দিয়েছে মঙ্গলকাব্যধারার অন্যান্য শ্রেণিগুলির থেকে অনেক বেশি।

আমাদের মনে রাখতে হবে মনসামঙ্গলের কবিদলে একজনও এমন নেই যিনি মুকুন্দ চক্রবর্তী বা ভারতচন্দ্রের মতো কালজয়ী কবিপ্রতিভার ধারক। অথচ কাব্যগুলি কালজয়ী। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, বাইশ কবিদের অনেকেই কালান্তরের সাহিত্যচর্চায় প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। চর্চার ক্ষেত্রে শুধু মধ্যযুগের কালিক সীমায় নয়, আধুনিক কালের শরীরলগ্ন পঠনদৃষ্টির কাছেও আবেদন সৃষ্টি করেছে এই কাব্যধারা। বিনির্মাণবাদী প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গল পাঠের প্রয়োজন সে আবেদন থেকেই উঠে আসে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি মনসামঙ্গলের বিনির্মাণবাদী পাঠপ্রচেষ্টা। কারণ পাঠপ্রক্রিয়া হিসেবে বিনির্মাণ একরৈখিক পাঠের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবাদ করে চলে। নির্ধারণ করতে চায় সৃজনের অন্তরে চাপা পড়ে থাকা বহুমাত্রিক পাঠ সম্ভাবনার চলমান ও নবায়মান তল।

বিনির্মাণবাদ বা বিনির্মাণ সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনার সঙ্গে জাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪) মোটামুটি সমার্থক হয়ে গিয়েছেন। এমন নয় যে জাক দেরিদা বিনির্মাণ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কিছু বলেননি। সময় ও সমকালীন তত্ত্ববিশ্বের নিষ্ঠ সমালোচক ছিলেন তিনি। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক জাক দেরিদা আলজিয়ার্সের এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩০ সালে। মাত্র ন'বছরের বালক দেরিদা দেখলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত। একদিকে ফরাসি উপনিবেশবাদের মাত্রাছাড়া আগ্রাসনের বিপক্ষে তখন ধীরে ধীরে আলজেরিয়ায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটছে। অন্যদিকে ইউরোপ জুড়ে নাৎসি প্রভাবে ইহুদি-বিদ্বেষের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দেরিদার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইতিহাসের গভীর আবর্তময় সময়ে। তাঁর সমকাল মানে দ্রুত বিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ। চারিদিকে তখন মানবতার আহুতি চলছে। ফ্যাসিবাদ, তোজোর নীতি, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, পার্ল হার্বার, হিরোসিমা-নাগাসাকির মহাকাব্যিক ট্রাজেডি, এসব স্থায়িত্বের তাবৎ ইমারতকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। ১৯৪৫ সালে শেষ হল বিশ্বযুদ্ধের নামে চলতে থাকা নরমেধ যজ্ঞ। ফ্যাসিবাদের পতন হন। হিটলারের

অবলুপ্তি হল। কম্যুনিস্ট রাশিয়া আর ডানপন্থী আমেরিকাকে কেন্দ্র করে আবার শুরু হল বিশ্বনিয়ন্ত্রণের নব্য প্রতিযোগিতা, যা পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সম্ভাবনা পোক্ত করে তুলবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করা বর্তমান গবেষণা কাজের উদ্দেশ্য নয় বলে সে দিকে আমরা অগ্রসর হতে চাই না। কিন্তু একটা কথা আমরা বলে নিতে চাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার মারণ রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে পাশ্চাত্য মননে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল, যা পরবর্তী বৌদ্ধিক চর্চার ও তত্ত্ববিশ্বের মানচিত্রটাকেই বদলে দিয়েছিল। একটা খুব গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল অস্তিত্ব। গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল স্থিতি। অর্থের স্থায়িত্ব। যেখানে মারণাস্ত্রের আত্মপ্রকাশে মানবজীবন ও পৃথিবী নামক গ্রহটার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সেখানে শব্দ (যাকে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ চূড়ান্ত স্থায়ী) ও বাক্যের অর্থবোধের স্থায়িত্বও প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড়াবে, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাতই সেই স্থায়ী ইমারত গঠনের চিরাচরিত ভাবনা চিন্তার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। বিনির্মাণের চিন্তাগত ভিত্তিভূমিটা খুঁজতে গেলে আমাদের ঠিক এই সমতলে এসে দাঁড়াতে হবে।

দেরিদা যখন মাত্র বারো বছরের কিশোর, অর্থাৎ ১৯৪২ সাল, তখন আলব্যের কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০) এমন দুটি গ্রন্থ ফরাসি সাহিত্যে সংযোজিত করলেন যা শুধু ফরাসি সাহিত্যকেই নয়, আন্দোলিত করল সমগ্র বিশ্বসাহিত্যকে। একটি 'The Outsider', এবং অন্যটি 'The Myth of Sisyphus'। তার ঠিক পরের বছর বেরিয়েছে জাঁ পল সার্ত্রের 'Being and Nothingness'। এগুলি পাঠক দেরিদার চিন্তাবিশ্বে যে প্রভাব ফেলেছিল, সন্দেহ নেই। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ' বইটিতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন যা আমাদের দেরিদার চিন্তাবিশ্ব গড়ে ওঠার প্রাথমিক আলোচনাবিন্দুটুকু চিনে নিতে সাহায্য করে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখছেন :

> দর্শন-চিন্তায় নতুন দিগন্তের উন্মোচক হিসেবে আজও যে দেরিদার জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠা---সেই দর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ মুকুলিত হয়েছিল ১৯৪৮-এ। সেবছর তিনি আকস্মিকভাবে গ্রাঁদ একোলে প্রস্তুতি-পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত জনৈক অধ্যাপকের বেতার-ভাষণ শুনতে পান। ঐ বক্তৃতায় পাঠক্রম সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তা তাঁর প্রাক্তন

> ছাত্র আলবেয়ার কাম্যু সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেন। দর্শন ও সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে দেরিদা তখনই প্রাথমিক প্রারণা লাভ করেন, তাঁর পরবর্তী কার্যক্রমের দিকে তাকিয়ে একথা আমরা বলতে পারি।[২]

দেরিদার বছরবিশেক বয়স থেকেই দর্শনচিন্তার প্রসার ঘটতে থাকে। হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), এডমুন্ড হুসের্ল (১৮৫৯-১৯৩৮) প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হতে থাকেন। আমরা জানতে পারছি তিনি এই সময় থেকে হেগেল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জাঁ ইপ্পোলিৎ-এর সঙ্গে একোলে নর্মাল সুপিরিয়রে কাজ করছেন। হুসের্লের চিন্তাবিশ্ব নিয়ে একটি সমালোচনামূলক লেখা দিয়ে দেরিদা তাঁর দর্শন ভাবনার নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলো জানাতে শুরু করেন। এগুলি পরে দেরিদার 'Writing and Difference' নামক বইতে প্রকাশিত হয়। উত্তরাধুনিক ভাবনার দ্বারা ক্রমেই নিজেকে প্রকট করে তুলতে থাকলেন দেরিদা, যার মূল লক্ষ্যই হল যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিকতার আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি।

বিনির্মাণকে জীবন ও ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা করেছেন দেরিদা। জীবন যেমন পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো গতিপথ বা উপসংহার মেনে চলে না, ঠিক তেমনি যেকোনো রকম সুনির্দিষ্ট অর্থের বা অন্বয়ের মধ্যে স্থগিত হওয়ার বিরুদ্ধে মত পোষণ করে বিনির্মাণ। ক্রমিক বা চলমান নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসেবেই দেরিদা বিনির্মাণকে ব্যাখ্যা করেছেন। যাবতীয় সম্ভাবনাময় অর্থ, ভাষার, অভিজ্ঞতার, মানবিক সংযোগের যাবতীয় সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে সংশয়িত করে তুলতে চায় বিনির্মাণবাদ। ফলে প্রতিটা পাঠে, প্রতিবেদনের মধ্যে, ব্যাখ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র নির্মাণ করেই পরমুহূর্তে তাকে প্রশ্নদীর্ন করে তোলে বিনির্মাণ। ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এ প্রসঙ্গে লিখছেন :

> বিনির্মাণতত্ত্বের মধ্যে একধরণের ব্যাখ্যা বা interpretation সাহিত্যিক বা অ-সাহিত্যিক, থেকেই যাচ্ছে। এবং একটি text-এর ব্যাখ্যা কখনোই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।... কাজেই এই ধরনের রচনার পাঠ নিয়তই পরিবর্তনশীল বা transformational।[৩]

জাক দেরিদার বিখ্যাত 'Of Grammatology' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'Translators Preface' অংশটিতে লিখেছেন :

> ...the structure preface-text becomes open at both ends. The text has no stable identity, stable

> origin.... each act of reading the text is a preface to the next.[8]

মোটামুটি এই কথাটিকেই বিনির্মাণবাদের মূল কথা বলা যায়। এটি সময় ও মর্জি উভয় বিচারেই উত্তর-অবয়ববাদী ভাবনা। দেরিদা তাঁর মতবাদকে কোথাও সাহিত্য সমালোচনার আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠিত মতবাদের সঙ্গে সমসারণির বলে দাবি করেননি। বলা ভালো সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি হিসেবে বিনির্মাণবাদকে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যাটা হল এই মতবাদ কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থগত প্রতিষ্ঠানকেই স্বীকার করে না। দেরিদা 'Free play' –তে বিশ্বাস রাখেন। পরবর্তীতে সবিস্তারে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেও এটুকু আমরা বলতে পারি 'কথন' আর 'লিখনের' পার্থক্য (Difference) আলোচনাতে ফার্দিনান্দ স্যসুরের (ফার্দিনান্দ স্যসুর : ১৮৫৭-১৯১৩) সঙ্গে দেরিদার এখানে মৌলিক প্রভেদ আছে। ফার্দিনান্দ স্যসুর লিখনের থেকে কথনের অর্থাভাসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরপক্ষে দেরিদা সেই অর্থগত স্বীকৃতিও কথনের ক্ষেত্রে মেনে নিতে রাজি নন। কারণ, বিনির্মাণ আসলে কোনো পদ্ধতি বা ভঙ্গী নয়; এটি একটি প্রক্রিয়া। কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে আধিভৌতিক বা মেটাফিজিক্যাল ভাবনা-চিন্তার দাসত্ব করার বিপরীত চলমান প্রক্রিয়া এই বিনির্মাণ বা ডিকন্সট্রাকশন। দেরিদার মতে লিখন আর কথনের ভাষিক অর্থবোধের নিয়মের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ নেই। দুটি ক্ষেত্রেই বিধি-নিষেধ, সংবিধান মোটামুটি একই। এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই একটি অন্যটির থেকে অধিকতর শ্রেয় বা পবিত্রতর। পবিত্রতার কথা আসছে একারনেই যে, পবিত্রতাও এক ধরণের মেটাফিজিক্যাল চিন্তাস্তর থেকে জাত হয়। লিখিত রূপকে বলনের থেকে কম পবিত্র মনে করার পিছনে থাকতে পারে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অভিসন্ধি বা complicity। এখান থেকেই সম্ভবত 'বাক্‌কেন্দ্রিকতা'-র উদ্ভব।

কোনো একটি বিশেষ পাঠ বা অর্থ বা কালগত সীমায় আটকে যাওয়াকে তথা কেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষাকে দেরিদা তাঁর 'Of Grammatology' গ্রন্থে 'বাককেন্দ্রিকতা' (Logocentrism) বলেছেন। এতে কোনো একক অর্থ বা ব্যাখ্যাগত মেরুকরণকে মেনে নিতে হয়। এই প্রবণতারই বিরোধিতা করেন দেরিদা। গ্রিক ভাষায় 'Logos' শব্দের অর্থ হল 'বাক্'। 'বাক্' আর প্রাচ্যের বেদের জ্ঞান অভিন্ন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ' বইটিতে লিখছেন :

> ভারতীয়দের কাছে যেমন 'বেদ' তেমনি ইউরোপীয়দের কাছে 'বাইবেল' বাক্ কেন্দ্রিকতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাইবেলের

> লিখিত রূপ আজ আমাদের কাছে সুলভ হলেও ঈশ্বরের বাণী প্রাথমিকভাবে কথ্য। তাই মানববিশ্ব মানে কথনবিশ্ব। ভিন্ন ভিন্ন অনুপুঙ্খের সমবায়ে সমগ্রের প্রতীতি গড়ে উঠছে অহরহ। প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে চাই যদি, অংশ ও সমগ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্বয়সূত্র আগে স্পষ্ট করে নিতে হবে। আর, তা সম্ভব হতে পারে কেবল কথনবিশ্বের বিনির্মাণে।[৫]

উত্তর আধুনিকতারও যদি কোনো প্রান্তসীমা হয়ে থাকে, বিনির্মাণবাদের চলাচল সেই প্রান্তজুড়ে। কারণ উত্তরাধুনিকতা যেকোনো ধরণের আধিভৌতিক বা মেটাফিজিক্যাল অবস্থান নির্বাচনেরই বিরোধিতা করে থাকে। বিনির্মাণের পাঠগত অনুসরণেও সেই বিরুদ্ধতাই প্রকটতা লাভ করে। জাক দেরিদা বিনির্মাণকে যেকোনো প্রতিষ্ঠানেরই বিপরীতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এমনকি কোনো পাঠকৃতির নির্দিষ্ট সমালোচনা পদ্ধতি হিসেবে বিনির্মাণবাদকে তুলে ধরতেও তাঁর আপত্তি। তাঁর মতে বিনির্মাণকে তত্ত্বও বলা যাবে না। কারণ তত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণও এক ধরণের মেটাফিজিক্যাল প্রচেষ্টা। নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে থাকে একটা অপরিবর্তনীয় অনড় প্রতিষ্ঠানের অভিব্যাক্তি। বিনির্মাণ এই প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করে। দেরিদার আলোচনার প্রক্রিয়াকে দেরিদা Grammatology বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বলতে আগ্রহী একারণেই। দেরিদার মতে চিহ্নতত্ত্বও অধিবিদ্যার কুহক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে না বলে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেও একটা অর্থগত প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করে নেওয়ার ইচ্ছে জাগে। একারণেই বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল স্যসুরের মধ্যে। অধ্যাপক অমল বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

> যদি চিহ্নতত্ত্বে কোনো কাজ না হয়, তাহলে ভাষাতত্ত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে ফলপ্রসূ হবে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন এক নতুন পদ্ধতির, যার সাহায্যে রচনার মধ্যে নিহিত অধিবিদ্যার বীজ সম্পর্কে অন্তত আমরা সজাগ থাকতে পারি। এই নতুন পদ্ধতি বা বিজ্ঞানকেই দেরিদা আখ্যা দিয়েছেন 'গ্রামাটোলজি' বা রচনার তন্ন তন্ন বিচার। এই নামটির আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্য দেরিদার নয়। উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি অভিধানিক লিত্রে (Litre) তাঁর অভিধানে 'গ্রামাটোলজি'র কথা উল্লেখ করেছেন।[৬]

এই গ্রামাটোলজির মূল কৌশল হল ডিকন্সট্রাকশন বা বিনির্মাণ। অর্থাৎ বিনির্মাণ কোনো পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি সেক্ষেত্রে গ্রামাটোলজিকে বলা যেতে পারে। বিনির্মাণ হল পথ। একটা পাঠপ্রক্রিয়া। এমন একটা পথ বা পাঠপ্রক্রিয়া, যা কোনো নির্দিষ্ট অর্থের এলাকায় পৌঁছে দেয় না। বরং কোনো নির্দিষ্ট অর্থে নোঙর করার চূড়ান্ত বিরোধিতা করে।

বিনির্মাণ এমন একটা পাঠ প্রক্রিয়া, যা কখনো থেমে যাওয়ার পক্ষে মত দেয় না। তাই প্রাগাধুনিক কাল থেকে মনসামঙ্গলের একটা কাহিনিই প্রতিনিয়ত পরিগ্রহণ করে এসেছে নতুন রূপ। আধুনিক সাহিত্যের সীমায় তা পঠিত হয়েছে আধুনিকসাহিত্যলগ্ন নানা সংরূপের (Genre) মধ্যে। মনসামঙ্গলের কাহিনির বিনির্মাণ ঘটেছে একালের নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতার মত আধুনিক সাহিত্যসংরূপের মধ্যে। বর্তমান গবেষণা সেই বিনির্মাণবাদী প্রেক্ষিতটিকে সামনে রেখে মনসামঙ্গল কাব্যের রূপ ও রূপান্তরণের অন্তরে প্রবেশ করতে চায়। সেকাল থেকে একালের পাঠক বা শ্রোতা স্রষ্টার আসন নিয়ে একই কাহিনিগত কাঠামোতে আচ্ছন্ন হয়ে কেন ও কীভাবে তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা (Interpretation অর্থে) দিলেন নতুন নতুন সংরূপকে আশ্রয় করে, এবং তার অব্যবহিত পরেই কীভাবে ভেঙে পড়ল পূর্ববর্তী অর্থের কাঠামো, বর্তমান গবেষণা তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য রূপরেখা নির্মাণে আগ্রহী। আর সে কারণেই বিনির্মাণবাদের তাত্ত্বিক আলোচনার সারাৎসারটুকু বুঝে নিয়ে সেই পথেই আমরা মধ্যযুগের বহুল প্রচারিত কাব্যটিকে পড়েছি। আমরা একই সঙ্গে চেয়েছি আধুনিক নানা সংরূপের স্রষ্টাদের মনসামঙ্গল পাঠে সচেতন অথবা অসচেতন ভাবে প্রযুক্ত বিনির্মাণবাদের প্রেক্ষিতটি বুঝে নিতে।

গবেষণাকর্মটি শুরু করার আগে আমরা এই বিষয়ে পূর্বে কোনো কাজ হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে সন্ধান চালিয়েছিলাম। আমরা দেখেছি প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য এই বিষয়ে কিছু কাজ করেছেন। তাঁর কাজটি 'বাকপ্রতিমা' প্রকাশনী থেকে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাজ বিনির্মাণ নিয়ে নয়, পুনর্নির্মাণ নিয়ে। তিনি কেবল উত্তরাধিকারের সন্ধান চালিয়েছেন। বিমল কুমার থান্দারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ওই একই বিষয়ে অনেক প্রাবন্ধিকের আলোচনা নিয়ে 'বিবেকানন্দ বুক স্টোর' থেকে 'বাংলা মঙ্গলকাব্য ও তার উত্তরাধিকার' নামে একটি গ্রন্থ। গ্রন্থবদ্ধ প্রবন্ধগুলি শিরোনাম অনুসারী। মঙ্গলকাব্যে বিনির্মাণ নিয়ে কিছু আলোচনা অধ্যাপক জহর সেনমজুমদারের আছে। কিন্তু তার ক্ষেত্র সংক্ষিপ্ত। তেমন সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা 'রত্নাবলী' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ও জয়িতা দত্ত সম্পাদিত

'পুরোনো বাংলা সাহিত্য চিন্তা ও চর্চা' নামের গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির কোনো কোনোটিতে প্রাবন্ধিকরা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জাক দেরিদাকে বোঝার ক্ষেত্রে তাঁদের সাবধানতার অভাব প্রকট। বিনির্মাণের নামে তাঁরা অধিকাংশই উত্তরাধিকারের চেনা পথে চলে গেছেন। সেই সংশয়গুলি দূর করেই বর্তমান গবেষণা পথ নির্মাণের চেষ্টা চালিয়েছে।

গবেষণাকার্যটি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সন্দীপকুমার মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। শুধু মেধাবস্তু দিয়ে নয়, নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণসংস্থাপন জ্ঞান, সম্পাদনাবুদ্ধির সবটুকু দিয়ে এই গবেষণা সন্দর্ভটি সুষ্ঠু ও সুষম ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন তিনি। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর শক্তি আমার নেই। গবেষণাকালে সম্পর্কটাও আর ধন্যবাদ জানানোর মতো আনুষ্ঠানিক থাকেনি। পরিবারের সমস্ত সদস্যের শুভকামনা না থাকলে এই কাজ সুসম্পন্ন হয় না। তাই তারা আমার হৃদয়ে থাক ভালোবাসায় ভিজে। আমার ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীদের ধন্যবাদ নানা সময় আমাকে এই সন্দর্ভ শেষ করার উৎসাহ ও ফুরসৎ দেওয়ার জন্যে। প্রণাম জানাই আমার ছাত্রাবস্থার প্রাথমিককালে রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁর অনুপ্রেরণায় তত্ত্বপাঠের আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল, সেই সঞ্জীব মহারাজ তথা স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীকে। জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য গ্রন্থাগার, জয়কৃষ্ণ পাঠাগার, রামমোহন পাঠাগার, চৈতন্য লাইব্রেরির আধিকারিকদের প্রণাম। তাঁরা সীমাতীত সাহায্য করেছেন আমায়। অনেক প্রবীণ অধ্যাপক এবং আমার শিক্ষাগুরুরা নিরন্তর আমায় মতামত দিয়ে সহায়তা করেছেন। সে তালিকা সুবৃহৎ। তাঁদের সকলকে আমি প্রণাম জানাই।

গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা অভ্র সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়েছি। বর্ণসংস্থাপন করেছি আমরা কালপুরুষ ফন্টে। বানানের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা আকাদেমি বানানবিধি অনুসরণ করেছি। সূত্র, টীকানির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের অধুনা অনুসৃত রীতিটি অনুসরণ করেছি। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে একটি করে অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেছি, যেখানে আমরা সংক্ষেপে সেই পরিচ্ছেদের অনুসিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করেছি।

গবেষণা পদ্ধতি

চিরাচরিত গবেষণা পদ্ধতির পরিচিত বিষয় যেমন, সাক্ষাৎকার বা সমীক্ষা বা তথ্য সংগ্রহ আমাদের বর্তমান গবেষণায় প্রযোজ্য নয়। একটি পাঠের ভিতর যে শব্দ-বাক্যের কাঠামো থাকে, তার বিপুল অর্থগত সম্ভাবনাকে মুক্ত করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

তাই বিনির্মাণের দৃষ্টিকোণই বর্তমান গবেষণাকর্মের একমাত্র দৃষ্টিকোণ। এই বিশেষ পাঠ প্রক্রিয়াকেই আমরা বর্তমান গবেষণায় প্রধান উপকরণ (Critical Tool) হিসেবে ব্যবহার করেছি। অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে সংরূপ ও তার কাঠামোগত উপাদান ধরে ধরে আমরা বিনির্মাণবাদী নিবিড়পাঠ করেছি। নিবিড়পাঠের সঙ্গে সময়-সঙ্গতি রক্ষা করে গবেষণাটিকে যথাযথ ভাবে ঘনপিনদ্ধ রাখতে আমরা এক একটি সংরূপের জন্য সর্বাধিক তিনটি পাঠ (Text) নির্বাচন করেছি। মূলত এক একটি পাঠ (Text) অন্তর্গত অপ্রকাশিত অর্থের সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ শব্দ ধরে ধরে বিনির্মাণবাদী নিবিড়পাঠই বর্তমান গবেষণায় উপযুক্ত গবেষণাপদ্ধতি হিসেবে আমরা গ্রহণ করায়, গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা গবেষণালগ্ন বই এক্ষেত্রে আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাল-লব্ধ তথ্য স্থান বিশেষে প্রভূত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আমাদের কাছে। যথাযোগ্য স্থানে তথ্যসূত্রে সে সমুদায় ঋণ স্বীকৃত হয়েছে। অধ্যায় শেষে যথোপযুক্ত আন্তর্জাতিক ও প্রচলিত পদ্ধতি মেনে তথ্যসূত্র সংযোজন করেছি আমরা। গবেষণা অভিসন্দর্ভের শেষ ভাগে সংযোজিত হয়েছে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি, চিত্রসূত্র ও টীকাসূত্র।

সূত্র ও টীকা

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৮-২২৯

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, সেপ্টেম্বর ২০১৩, জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৪

৩. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৪৪

৪. Derrida, Jacques, 2002, Of Grammatology, 'Translator's Preface', Gayatri Chakravorty Spivak (Translated), Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, p. xii

৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৮

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, জানুয়ারি ২০১৪, উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ. ২৯